OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 662 - 667
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘মৃগয়া’ : সেলুলয়েডে মৃণাল সেন-এর শ্রেণি নিরিক্ষা

অসীম হালদার
Email ID: ashimhalder2016@gmail.com
0009-0005-080-1287

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Mrigayaa, Mrinal Sen, Class Exploitation, Tribal Oppression, Colonial Rule, Colonial Judicial System, Social Injustice, Adivasi Identity, Cinematic Aesthetics, Resistance and Justice.

Abstract
Mrinal Sen’s ‘Mrigayaa’ (1976) is a significant film based on Bhagabati Charan Panigrahi’s short story ‘Shikar’. The film portrays colonial oppression, the exploitation of the Santhal tribal community, class inequality, and the inhumanity of the judicial system. Ghinuya kills the moneylender Gobinda Sardar to avenge the dishonour inflicted upon his wife. Although he considers his act justified, British law sentences him to death. This tragic outcome exposes the conflict between indigenous values and colonial law. Mithun Chakraborty’s performance, K. K. Mahajan’s realistic cinematography, and Salil Chowdhury’s music deepen the film’s social and aesthetic significance. The varied use of light, shadow, silence, and camera techniques visually articulates the conflict between the oppressor and the oppressed. Thus, Mrigayaa is not merely a story of hunting; it is a significant cinematic portrayal of colonial power, social injustice, and the marginalised people’s aspiration for justice.

Discussion

গল্প ‘শিকার’, ১৯৩৬ সালের মে মাসে ওড়িশার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘আধুনিক’-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সালে ১৯২০-এর দশকে ওড়িশার জঙ্গলঘেরা এলাকার সহজ-সরল সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, বন্যপ্রাণীদের আক্রমণ এবং একইসঙ্গে স্থানীয় ক্রূর মহাজনদের আর্থিক ও সামাজিক শোষণের চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে ধরা পড়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল লেখক এবং সমাজ-সংস্কারক ভগবতী চরণ পাণিগ্রাহীর এই ছোটগল্পকে পরিচালক মৃণাল সেন সেলুলয়েডের পর্দায় রূপ দিলেন ‘মৃগয়া’ নামে, শুভমুক্তি ৬ জুন ১৯৭৬, ডবল ভার্সনের ছবি। তবে এই দু’এর মধ্যে মূলগত একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। সেই ভাবগত তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান আলোচ্য নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। মূল ছোটগল্প ‘শিকার’ আকারে বেশ সংক্ষিপ্ত। পরিচালক মৃণাল সেন চলচ্চিত্রে এই গল্পের মূল কাঠামোর সাথে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অবয়ব যুক্ত করেছেন। তিনি ১৯২০-এর দশকের ঔপনিবেশিক শাসন, আদিবাসীদের শোষণ এবং তৎকালিন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও আদিবাসী ধনুর্ধরের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের মানবিক ও রাজনৈতিক মাত্রাটিকে অনেক বেশি প্রসারিত করেছেন।

> “The moneylenders, or dikus, exploited the innocence and illiteracy of the tribal people by charging exorbitant rates of interest. Land alienation and debt bondage became the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> defining features of tribal life in northern Odisha and Chota Nagpur during the early 20th century."[১]

'শিকার' গল্পে ঔপনিবেশিক ভারতের আদিবাসী সমাজ ও শ্রেণিশোষণের এক মর্মস্পর্শী চিত্র ধরা পড়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঘিনুয়া। সে একজন অত্যন্ত সহজ-সরল, সাহসী আদিবাসী যুবক এবং অসাধারণ দক্ষ একজন শিকারি। এর আগে জঙ্গলের একটি মানুষখেকো বাঘ শিকার করে সে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল। গল্পের খলনায়ক গোবিন্দ সর্দার নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজন, গরিব আদিবাসীদের অমানবিক শোষণ করে। কেবল আর্থিক শোষণই নয়, ঘিনুয়ার স্ত্রীর ওপরও তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। গোবিন্দ সর্দারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং নিজের স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে ঘিনুয়া তাকে হত্যা করে। এই হত্যার পিছেনে ঘিনুয়ার আদিবাসী মন যুক্তি দেয় যে মানুষ গরিবের রক্ত চোষে এবং নারীদের সম্মানহানি করে, সে তো মানুষখেকো বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। তাই সে গোবিন্দ সর্দারকে সমাজের এক ক্ষতিকারক 'জানোয়ার' বা 'শিকার' হিসেবেই বিবেচনা করে। সর্দারকে হত্যার পর ঘিনুয়া সোজা ব্রিটিশ প্রশাসকের (সাহেব) কাছে হাজির হয়। তার সরল বিশ্বাস ছিল, মানুষখেকো বাঘ মারার মতো এই বড় 'জানোয়ার'টিকে মারার জন্যও সাহেব তাকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক আইনে খুনের অপরাধে ঘিনুয়াকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঘিনুয়া বুঝতে পারে না, কেন একটি জানোয়ারকে মারার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হল, আর তার চেয়েও বড় এক শোষক জানোয়ারকে মারার জন্য তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হচ্ছে। চিত্র পরিচালক মৃনাল সেন গল্পের মূল সুর অক্ষুন্ন রেখে যুক্তিনিষ্ঠ তন্বিষ্ঠে ক্যামেরা তাক করলেন তৎকালীন ঔপনিবেশিক শোষণ ও প্রতিবাদের একটি মহাকাব্যিক রূপের দিকে।

মৃণাল সেন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের আবহ এবং আদিবাসীদের বিদ্রোহের ইতিহাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা মূল ছোটগল্পের চেয়ে চলচ্চিত্রে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক রূপ পেয়েছে। আদিবাসীরা কীভাবে জমিদার, মহাজন এবং তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার হাতে সর্বস্বান্ত হয়, তা এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। ঘিনুয়ার মতো সরল মানুষরা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকলেও তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বঞ্চনার পাহাড়। চলচ্চিত্রের প্রধান কুশীলব এবং তাদের অভিনীত চরিত্রগুলি হল মিঠুন চক্রবর্তী (ঘিনুয়া): তিনি একজন আদিবাসী ধনুর্ধরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি তার অসাধারণ শিকারি দক্ষতার জন্য পরিচিত। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই মিঠুন চক্রবর্তীর চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। মমতা শঙ্কর (দুগরি): তিনি ঘিনুয়ার স্ত্রী বা সঙ্গিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এটিও তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র। রবার্ট রাইট (ম্যাজিস্ট্রেট) : তিনি ব্রিটিশ প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অভিনয় করেছেন, শিকারের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং ঘিনুয়ার বন্ধু। চলচ্চিত্রে ঘিনুয়া এবং ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পর্কটিকে শুধু 'শিকারি ও বন্ধু' হিসেবে না দেখিয়ে, তাদের মধ্যেকার শ্রেণিগত ও ক্ষমতাগত দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে একজন ব্রিটিশ প্রশাসক হিসেবে তার মানবিক দিক এবং ঔপনিবেশিক শাসকের কঠোর আইনানুগ রূপের যে দ্বান্দ্বিক অবস্থান, তা চলচ্চিত্রের পর্দায় মৃণাল সেন নিপুণভাবে তৈরি করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসক এবং আদিবাসী ঘিনুয়ার মধ্যকার সম্পর্কটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, ব্রিটিশরা আদিবাসীদের কেবল তাদের 'শিকারের' সঙ্গী হিসেবে বা মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখত, কিন্তু তাদের মানবিক অধিকার বা যন্ত্রণার প্রতি তাদের কোনও সহানুভূতি ছিল না। ব্রিটিশ প্রশাসক (যিনি একজন শিকারি হিসেবেও পরিচিত) আইনের শাসন বজায় রাখার নামে আদিবাসীদের ওপর ঔপনিবেশিক শক্তির কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন। এই চরিত্রটি একদিকে যেমন আদিবাসী ধনুর্ধর ঘিনুয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, অন্যদিকে বিচারিক প্রক্রিয়ার সময় ব্রিটিশ আইন ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় স্থানীয় জমিদার ও মহাজনরা গ্রামবাসীদের ওপর যে শোষণ চালাত, তার একটি স্পষ্ট ছবি চলচ্চিত্রটিতে ফুটে উঠেছে। প্রশাসন এই শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে প্রায়শই প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ নেয়।

> "জমিদার-মহাজনসহ সমগ্র ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। কারণ, ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থাই ইহার শোষণ ও শাসন-কার্যের প্রয়োজনে জমিদার ও মহাজনদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দ্বারা ইহাদের রক্ষা ও পোষণ করিত। এই ত্রিশক্তি মিলিতভাবেই হতভাগ্য সাঁওতালদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষিয়া লইতেছিল।"[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চলচ্চিত্রের শেষ দিকে ঘিনুয়ার বিচারের ঘটনায় দেখা যায়, কীভাবে ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থা স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতি ও তাদের সংগ্রামের প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র লিখিত আইনের ভিত্তিতে বিচার করে। ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে একজন আদিবাসীর আত্মরক্ষামূলক বা আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়ার কোনও মূল্য ছিল না, যা তাদের শাসনব্যবস্থার অমানবিক রূপটিকে তুলে ধরে।

'মৃগয়া' চলচ্চিত্রে ঘিনুয়া চরিত্রটি মূলত আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি, যে ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থা ও স্থানীয় শোষণের মুখে অসহায়। ঘিনুয়ার স্ত্রীকে মহাজন গোবিন্দ সর্দার তার শোধ না হওয়া ঋণের দোহাই দিয়ে এবং জোরপূর্বক নিজের কুঠিতে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই অপমানিত ঘিনুয়া ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং মহাজনকে হত্যা করে। মহাজনকে হত্যা করার পর ঘিনুয়া মনে করেছিল তার বন্ধু ব্রিটিশ প্রশাসক তাকে ক্ষমা করে দেবেন, কারণ সে বিশ্বাস করত যে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার অধিকার। সে কোনও আত্মগোপন না করে সোজা ব্রিটিশ প্রশাসকের কাছে গিয়ে এই হত্যার কথা স্বীকার করে এবং দাবি করে যে সে বনের সবচেয়ে খতরনাক 'শিকার' মহাজনকে শিকার করেছে। সামাজিকভাবে, ঘিনুয়ার এই পরিণতি ব্রিটিশ শাসনের দ্বিমুখী চরিত্র উন্মোচন করে। একদিকে তার শিকারি দক্ষতা ইংরেজ প্রশাসকদের কাছে বিনোদনের খোরাক ছিল কিন্তু আইনত সে ছিল একজন সাধারণ 'অপরাধী'। শেষ পর্যন্ত, আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, যা আদিবাসী অধিকার ও আইনের শাসনের মধ্যকার গভীর দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত করে। ঘিনুয়া দেখে যে ব্রিটিশ আইন এবং স্থানীয় প্রভাবশালীরা এই শোষণের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না, বরং তাদেরই পক্ষ নেয়। পরবর্তী পরিণতি হিসেবে, আইনি প্রক্রিয়ায় ঘিনুয়ার এই স্বীকারোক্তিকে একটি পূর্বপরিকল্পিত খুন হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা এবং আইন তার আদিবাসী প্রেক্ষাপট বা শোষণের শিকার হওয়ার যন্ত্রণা বিবেচনা না করে, তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায়, ঘিনুয়া ব্রিটিশ প্রশাসকের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখেছিল কারণ তাদের মধ্যে শিকারকে কেন্দ্র করে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘিনুয়া একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিল এবং সে ব্রিটিশ প্রশাসকের সাথে জঙ্গল ও শিকারের অভিযানে অংশ নিত। ভেবেছিল যে, সে মহাজন গোবিন্দ সর্দারকে যে কারণে হত্যা করেছে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে তা ব্রিটিশ প্রশাসক একজন শিকারি ও সহমর্মী মানুষ হিসেবে অনুধাবন করতে পারবেন। তার ধারণা ছিল, প্রশাসনের চোখে তাদের এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও শিকারের অভিজ্ঞতার মূল্য বিচারিক আইনের চেয়ে বেশি হবে। 'মৃগয়া' চলচ্চিত্রে মহাজন গোবিন্দ সর্দারকে হত্যার পর ঘিনুয়া তার কাজের জন্য কোনো অনুতাপ প্রকাশ করেনি; বরং সে একে নিজের অধিকার ও ন্যায়বিচার বলে মনে করত। সে গর্বের সাথে ব্রিটিশ প্রশাসকের কাছে গিয়ে স্বীকার করে যে সে মহাজনকে শিকার করেছে কারণ মহাজন ছিল তাদের গ্রাম ও মানুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ভয়ংকর 'শিকার'। সে মহাজনকে কোনও সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়, বরং পশুশিকারের মতোই একটি জরুরি কাজ হিসেবেই হত্যা করেছিল। ঘিনুয়া ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা বা আইনের জটিলতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সে জগতটিকে তার আদিবাসী মূল্যবোধ এবং সরল নৈতিকতার দৃষ্টিতে দেখত। ঘিনুয়ার কাছে 'ন্যায়বিচার' ছিল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা অন্যায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিকার, যেখানে কোনও পশু বা অপরাধীকে মেরে ফেলা একটি স্বাভাবিক সমাধান।

ঘিনুয়া মনে করেছিল, সে যেহেতু তার স্ত্রীর ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং ব্রিটিশ প্রশাসকের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বিশ্বাসে এই কাজ করেছে, তাই তার কাজটি 'খুন' হিসেবে গণ্য হবে না, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত 'শিকার' হিসেবে বিবেচিত হবে। মহাজন গোবিন্দ সর্দারকে হত্যার ঘটনাকে 'খুন' না বলে 'শিকার' বলেছিল, কারণ সে জগতটিকে তার নিজস্ব আদিবাসী মূল্যবোধ এবং সরল নৈতিকতার দৃষ্টিতে দেখত। ঘিনুয়ার কাছে ন্যায়বিচার মানে ছিল অন্যায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিকার, যেখানে কোনও ক্ষতিকারক প্রাণী বা অত্যাচারীকে মেরে ফেলা একটি স্বাভাবিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত হয়। সে ব্রিটিশ প্রশাসককে একজন বন্ধু এবং শিকারি সহযোগী হিসেবে দেখত, যার ফলে সে মনে করেছিল আইনের চেয়ে তাদের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া বেশি শক্তিশালী হবে। ব্রিটিশ দণ্ডবিধির জটিল নিয়ম বা ধারার (যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা) সাথে সে পরিচিত ছিল না, যা মানুষের আবেগ বা ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে লিখিত আইনের শাসনকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বড় করে দেখে। বিচারক ঘিনুয়ার আদিবাসী মূল্যবোধ বা তার ব্যক্তিগত ন্যায়বিচারের যুক্তি গ্রহণ করেননি কারণ তিনি কঠোরভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের শাসনে সীমাবদ্ধ ছিলেন। বিচারক বা আদালত প্রথাগত আইনের বাইরে কোনও মানবিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেননি। ব্রিটিশ আইনের যান্ত্রিক ও আবেগহীন চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘিনুয়ার আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিবাদী পদক্ষেপকে আইনের চোখে কেবল 'অপরাধ' হিসেবেই দেখা হয়, তার পিছনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়।

> "Tribal perceptions of justice were rooted in custom and moral economy, which came into direct conflict with the rigid legal apparatus of the British Raj. Actions considered morally justified by tribals to eradicate local oppressors were treated as severe crimes under colonial law."[৩]

ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখা হত এবং সেখানে হত্যার পিছনের কারণের চেয়ে আইনত 'খুন' হিসেবে প্রমাণিত হওয়াটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য। বিচারকের কাছে মহাজন গোবিন্দ সর্দারকে হত্যার বিষয়টি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যা সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি স্বরূপ। আদিবাসী ঘিনুয়ার কাছে যা ছিল 'শিকার' বা 'প্রতিশোধ', বিচারকের আইনি দৃষ্টিতে তা ছিল একটি বিচারবহির্ভূত অপরাধ, যা তিনি কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেননি। চলচ্চিত্রটিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা আদিবাসীদের অধিকার, মূল্যবোধ বা তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কোনওভাবেই গুরুত্ব দিত না বা বুঝতে পারত না। আদালত বা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের কঠোর আইনের শাসন ও ঔপনিবেশিক কাঠামোর বাইরে কোনও মানবিক বা সাংস্কৃতিক যুক্তিকে বিবেচনায় নেয়নি।

মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'ঘিনুয়া' চরিত্রটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয়ের বিশেষত্বগুলি হলও- সহজ-সরল ও আদিবাসী সত্তা, মিঠুন একজন আদিবাসী শিকারির শারীরিক ভাষা, হাঁটাচলা এবং বন্য পরিবেশের প্রতি যে সহজাত সম্পর্ক, তা পর্দায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয়ে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, যা চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ঘিনুয়া পেশায় একজন দক্ষ ধনুর্ধর। মিঠুন তাঁর তীর-ধনুক চালনার ভঙ্গিমা এবং জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সতর্কতা ও ক্ষিপ্রতার মাধ্যমে একজন দক্ষ শিকারির চরিত্রকে প্রাণবন্ত করেছেন। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মিঠুন কেবল একজন শিকারিকে নয়, বরং তার বঞ্চনা, অসহায়ত্ব এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার যে বিশ্বাসভঙ্গ হয়, সেই গভীর যন্ত্রণাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের শেষভাগে যখন তিনি বুঝতে পারেন আইন তাঁর জীবনের কোনো মূল্য দেয় না, তখন তাঁর চোখের চাহনি ও অভিনয়ে যে বিষাদ ফুটে ওঠে, তা দর্শকদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। এটি মিঠুন চক্রবর্তীর প্রথম চলচ্চিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অভিনয়শৈলী ছিল পরিণত এবং প্রাণবন্ত। এই চরিত্রের মাধ্যমেই তিনি প্রথমবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন, যা তাঁর অভিনয় ক্ষমতার এক বড় প্রমাণ। চলচ্চিত্রটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং তৎকালীন ভারতীয় সমাজের শোষণমূলক কাঠামোর একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক চিত্রায়ণ। ব্রিটিশ প্রশাসক এবং স্থানীয় জমিদার বা মহাজনদের আঁতাত কীভাবে সাধারণ আদিবাসী ও গ্রামবাসীদের নিঃস্ব করে তোলে, তা এই চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে শিকারি মানসিকতা এবং শোষণের এক আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। নায়ক ঘিনুয়ার জীবনের ট্র্যাজেডি তুলে ধরে দেখানো হয়েছে কীভাবে ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা এবং তাদের আইন আদিবাসীদের জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা ও শৃঙ্খলার স্বার্থে কাজ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে এনে তৎকালীন সময়ে জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা সাধারণ মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদের রাজনৈতিক সুরটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কালজয়ী চলচ্চিত্র 'মৃগয়া'-এর চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন কিংবদন্তি চিত্রগ্রাহক কে. কে. মহাজন। ভারতীয় সমান্তরাল ধারার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মহাজনের ক্যামেরার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসিত। মৃণাল সেনের অন্যান্য চলচ্চিত্রের মতোই 'মৃগয়া'-তে ক্যামেরার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং নিরীক্ষাধর্মী। গ্রামীণ ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন এবং ঔপনিবেশিক আমলের প্রেক্ষাপটকে মহাজন অত্যন্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিপুণভাবে ক্যামেরাবন্দি করেছেন। সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যে প্রাকৃতিক আলো এবং ছায়ার ব্যবহার ছিল দেখার মতো। বিশেষ করে উপজাতীয় জীবনযাত্রা এবং শিকারের দৃশ্যগুলি ফুটিয়ে তোলার সময় ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল এবং কম্পোজিশন দর্শকদের ওই সময়ের পরিস্থিতির সাথে সরাসরি যুক্ত করতে সাহায্য করেছে। শিকারের দৃশ্যগুলিতে কোনও কৃত্রিমতা রাখা হয়নি। ঘন অরণ্য এবং প্রকৃতির মধ্যে চরিত্রদের স্বাভাবিক নড়াচড়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরা যেন নিজেই একজন প্রত্যক্ষদর্শী বা শিকারির ছায়াসঙ্গী হয়ে কাজ করেছে। উত্তেজনাকর মুহূর্তে যখন আদিবাসী যুবক (মিঠুন চক্রবর্তী) বা ব্রিটিশ প্রশাসক শিকারের পেছনে ধাওয়া করেন, তখন স্থির ক্যামেরার পরিবর্তে হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ও রোমাঞ্চ তৈরি হয়, যা শিকারের অভিজ্ঞতাকে আরও তীব্র করে তোলে। শিকারের সময় দ্রুতগতির অ্যাকশন এবং চরিত্রের মানসিক একাগ্রতা বোঝাতে ঘনঘন শট বদল করা হয়েছে। একদিকে যেমন বনের বিশালতাকে তুলে ধরতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শট ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনই লক্ষ্যভেদের আগের মুহূর্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা ধনুর্ধরের হাতের সূক্ষ্ম নড়াচড়াকে দেখাতে ক্লোজ-আপ শট ব্যবহার করা হয়েছে। যখন উপজাতি চরিত্রদের অসহায়তা বা শোষণ দেখানো হয়েছে, তখন মহাজন প্রায়শই লো-অ্যাঙ্গেল (Low-angle) বা আই-লেভেল শট ব্যবহার করেছেন, যা শোষিত মানুষগুলির ওপর জমিদার বা ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবকে দৃশ্যত শক্তিশালী করে তোলে। চলচ্চিত্রের অধিকাংশ দৃশ্যেই ওয়াইড শট (Wide shot) বা ল্যান্ডস্কেপ ফ্রেমের ব্যবহার দেখা যায়। এটি অরণ্য এবং গ্রামীণ ভারতের বিশালতাকে ধারণ করে, যা চরিত্রগুলিকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপন করে। এই অ্যাঙ্গেলগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তুলে ধরে। শিকারের দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল দ্রুত পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা বা ক্লোজ-আপ শট ব্যবহার করে উত্তেজনার মুহূর্তগুলিকে দর্শকদের খুব কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে শিকারি এবং শিকারের মধ্যকার টানাপোড়েন স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যখন ব্রিটিশ প্রশাসক এবং আদিবাসী যুবক (মিঠুন চক্রবর্তী)-এর কথোপকথন চলে, তখন প্রায়শই ওভার-দ্য-শোল্ডার (Over-the-shoulder) শট ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দুজনের সম্পর্কের জটিলতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ করে, যা দর্শকের মনোযোগ সরাসরি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। মৃণাল সেন এবং কে. কে. মহাজনের জুটির কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে ক্যামেরার ভাষার সামঞ্জস্য। তাঁরা চটকদার বা বাহুল্যবর্জিত ক্যামেরার কাজের চেয়ে গল্পের গভীরতাকে ফুটিয়ে তোলার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। মৃগয়া চলচ্চিত্রটিতে মূলত শোষিত উপজাতি এবং ঔপনিবেশিক শাসকের মধ্যকার দ্বন্দ্বের গল্প। ক্যামেরার মুভমেন্ট এবং ফ্রেমের মাধ্যমে মহাজন এই শোষণের বৈষম্যকে দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন। চলচ্চিত্রটির প্রতিটি দৃশ্য যেন একটি স্থিরচিত্রের মতো নিখুঁত, যা ছবির রাজনৈতিক এবং সামাজিক বার্তাকে আরও জোরালো করেছে। মৃণাল সেন প্রসঙ্গে উদয়ন গুপ্ত বলেছিলেন -

> "ভারতীয় দর্শকেরা সিনেমাহলে যায় তাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে পালিয়ে একটু বিনোদন পেতে— কিন্তু আমার সিনেমার বিষয়গুলো সাধারণ জীবনের এত কাছাকাছি যে জনপ্রিয় আপিল সেখানে কম ... আমি মনে করি দর্শককে কেবল নাড়া দেওয়া বা অস্বস্তিতে ফেলাই যথেষ্ট নয়, তাদের মনের ভেতর উস্কানিদাতা হিসেবে কাজ করাই আসল কাজ।"[৪]

'মৃগয়া' চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সলিল চৌধুরী। এই চলচ্চিত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা সাউন্ডের ব্যবহার অত্যন্ত সচেতন ও শৈল্পিক, যা গল্পের গম্ভিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সলিল চৌধুরী চিরাচরিত উচ্চকিত আবহ সঙ্গীতের পরিবর্তে অনেক বেশি পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। সিনেমার গ্রামীণ প্রেক্ষাপট এবং আদিবাসী জীবনের সহজ-সরল চিত্র ফুটিয়ে তুলতে লোকজ সুরের ছোঁয়া ব্যবহার করা হয়েছে। মৃণাল সেনের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'নিস্তব্ধতা'। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে কোনও সঙ্গীতের পরিবর্তে নিস্তব্ধতাকে ব্যবহার করা হয়েছে, যা দর্শকের মনে গভীর চাপের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শোষণের দৃশ্যগুলিতে আবহ সঙ্গীত যখন থেমে যায়, তখন আদিবাসী চরিত্রগুলির অসহায়তা আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। বনাঞ্চল এবং প্রকৃতির শব্দ— যেমন পাখির ডাক, বনের ঝিঁঝিঁ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 662 - 667
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পোকার শব্দ বা বাতাসের শব্দ— সরাসরি সাউন্ড এফেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি সিনেমাটিকে একটি বিশেষ 'ডকুমেন্টরি স্টাইল' বা বাস্তবসম্মত রূপ দিয়েছে, এখানেই মৃণাল সেনের নিজস্বতা।

> "মৃণালের নিয়ম না মানার প্রবণতাই ওঁর শৈলীর প্রধান উপাদান। ও নির্দিষ্ট কোনও ছকে নিজেকে আটকে রাখতে অস্বীকার করে এবং প্রতিনিয়ত নতুন রূপকল্প ও ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।"[৫]

যখন ব্রিটিশ প্রশাসন বা জমিদারের অত্যাচারের কোনও দৃশ্য আসে, তখন সঙ্গীতের টোন বদলে যায়। মৃদু সুর থেকে হঠাৎ করে একটি চাপা উত্তেজনাকর আবহ তৈরি করা হয়, যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝিয়ে দেয়। সামগ্রিকভাবে, 'মৃগয়া'-তে সঙ্গীত কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং গল্পের প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' চলচ্চিত্রে আলোর ব্যবহার কেবল দৃশ্যমানতার জন্য নয়, বরং গল্পের গভীরতা এবং মেজাজ বা 'মুড' তৈরিতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চিত্রগ্রাহক কে. কে. মহাজন প্রাকৃতিক আলো এবং ছায়ার সূক্ষ্ম ব্যবহারের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চলচ্চিত্রের অনেক দৃশ্যেই কৃত্রিম আলোর চাকচিক্য এড়িয়ে প্রাকৃতিক আলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অরণ্যের ঘন ছায়া এবং গ্রামের সাধারণ কুঁড়েঘরের অন্দরমহলে যে ধরনের আলো-আঁধারি থাকে, তা গল্পের সারল্য এবং আদিবাসী জীবনযাত্রার কঠোরতাকে তুলে ধরেছে। জমিদার বা ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্দরমহলের সাথে আদিবাসী গ্রাম্য পরিবেশের আলোকসজ্জায় এক স্পষ্ট পার্থক্য রাখা হয়েছে। জমিদার বাড়ির দৃশ্যে আলোর ব্যবহারে একধরনের আভিজাত্য বা কর্তৃত্বের ছাপ থাকে, যা শোষণের প্রতীকী উপস্থাপনা। অন্যদিকে, আদিবাসী চরিত্রদের ক্ষেত্রে আলো অনেক সময় তাদের অসহায়তাকে বা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে। চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় মুহূর্তে আলোর ব্যবহার চরিত্রের ভিতরের দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করেছে। বিশেষ করে যখন ব্রিটিশ প্রশাসক এবং আদিবাসী যুবকের মধ্যে কথোপকথন হয়, তখন আলোর খেলা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং বিশ্বাসের দোলাচলকে দর্শকের সামনে আরও প্রকট করে তোলে। অনেক জায়গায় আলোর অভাব বা অন্ধকারকে শৈল্পিক প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার যেন শোষিত মানুষের নীরব আর্তনাদ বা পরবর্তী বিপদের আগাম সংকেত হিসেবে কাজ করে।

সামগ্রিকভাবে, 'মৃগয়া' চলচ্চিত্রটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং শোষক ও শোষিত—এই দুই ভিন্ন শ্রেণির মানুষ কীভাবে শিকারের মাধ্যমেই একে অপরের কাছাকাছি আসে বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, তা ফুটিয়ে তুলতেই নির্মিত হয়েছে। পরিচালনার দক্ষতা, ক্যামেরা কৌশল, আলো ও শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 'মৃগয়া' চলচ্চিত্রটি শিকার গল্পকে ছাড়িয়ে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়।

Reference:

১. পতি, বিশ্বময়, রেজিস্ট্রি ডমিনেশন: পিজ্যান্টস, ট্রাইবালস অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট ইন ওড়িশা, ১৯২০–১৯৫০, মনোহর পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ৪২-৪৫

২. রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম - তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬৫, পৃ. ৩১৮

৩. সেন, অশোক কুমার, ফ্রম মিথস টু মার্কেটস : এসেস অন ছোটনাগপুর হিস্ট্রি। মনোহর পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ১০২-১০৫

৪. Gupta, Udayan. 'introducing Mrinal Sen', Jump Cut : A Review of Contemporary Media, No. 12/13, Dec. 1976, p. 9–10

৫. Ray, Satyajit. Our Films, Their Films. Orient Blackswan, 1976, p. 94